কিশোর রহস্য উপন্যাস

ভয়াল রাতের হাতছানি

জুবায়ের হুসাইন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

আজকের আকাশটা বেশ পরিষ্কার। এক চিলতে মেঘের দেখা পাওয়া দুষ্কর। যেন কোনো এক শিল্পী নীল রঙের আঁচড় বুলিয়ে দিয়েছে সারা আকাশের শামিয়ানায়।ও'ও'ওওওওওওও

ও না, কয়েকটা দুধেল সাদা মেঘের টুকরো পেজা তুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে ওই নীল শামিয়ানার এখানে-ওখানে। পাশ দিয়ে একদল বালিহাঁস উড়ে গেল। বোধ হয় খাদ্যের সন্ধানে বের হলো। সন্ধ্যায় ঠিকই পেট ভর্তি করে একইভাবে ফিরে যাবে আপনার নীড়ে। প্রকৃতির এ এক অপূর্ব খেলা! দেখে দেখে দু-চোখ ঝাপসা হয়ে যাবে, তবুও দেখার তৃষ্ণা মিটবে না। এই তো আমার দেশ, আমার প্রাণের বাংলাদেশ। মহান আল্লাহর নিপুণ সৌন্দর্যমাখা অপরূপ রূপের ছটা! সে কারণেই গেয়ে উঠতে মন চায়—অপরূপ রূপ দেখে ভরে অন্তর/সবুজ আঁচল দিয়ে ঘেরা প্রান্তর/চোখ মেলে যত দেখি হয় নাকো শেষ/খোদার করুণা সে যে আমার স্বদেশ।

ওর নাম শামসুল আলম। তবে আলম নামেই বেশি পরিচিত। আমাদের দেশের একটা রীতি হচ্ছে, কাউকে তার পূর্ণ নামে না ডেকে একটা ছোটো নামে ডাকা। অন্যান্য দেশেও সম্ভবত একই পদ্ধতি প্রচলিত। যা-ই হোক, এই ছোটো নামে ডাকার কারণেই মানুষের ডাকনামের সৃষ্টি হয়েছে।

আলম নবম শ্রেণির ছাত্র। লেখাপড়ায় মোটামুটি। মুক্তেশ্বরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও। পরিবারের সদস্য চারজন। মা ইন্তেকাল করেছেন ছয় বছর আগে। বাবা সাইদুল করিম মুক্তেশ্বরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। এ ছাড়া আলমের বড়ো বোন নাদিরা ইয়াসমিন ও তার একমাত্র সন্তান রাহাত ওদের সঙ্গে থাকে। স্বামীর

দাবি পূরণ করতে না পারায় অপমান ও লাঞ্ছনার ঝুড়ি ভরাট করে স্বামীর ঘর থেকে নাদিরাকে 'চিরবিদায়' নিতে হয়েছে। নাদিরাকে যখন একপ্রকার তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন ও সন্তানসম্ভবা।

সাইদুল করিম সাহেব 'কেস' করেছিলেন। নিয়াজ মুহাম্মদকে মানে নাদিরার স্বামীকে ধরাও হয়। কিন্তু ধরার সাত দিন পরই সে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় কী এক অজ্ঞাত কারণে। সাইদুল করিম কিংবা নাদিরা ইয়াসমিন আর এগোননি। এর দেড় মাস পর রাহাতের জন্ম হয়।

আলমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজন, দুজনে একসাথে স্কুলে যাওয়া-আসা করে। ওদের মধ্যে খুবই ভাব। যাকে বলে—জিগড়ি দোস্ত।

ওরা স্কুলের পথে রওনা হওয়ার একটু পর সাইদুল করিম সাহেব রওনা হন। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। এই 'রুটিনমাফিক কর্মসাধন' চলে আসছে অনেক দিন ধরে।

থার্ড পিরিয়ডে সাইদুল করিম সাহেবের একটা ক্লাস ছিল নাইন/বি-তে। এই ক্লাসের সহকারী ক্লাস ক্যাপ্টেন শামসুল আলম। ক্যাপ্টেন বিল্টু আজ আসেনি। সংগত কারণেই ক্লাসে আজ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আলমের।

ক্লাসের বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও স্যার এলেন না। সহপাঠীদের পরামর্শে আলম তাকে ডাকতে গেল। ওর কাছে একটু অবাকই লাগছে। ও স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কোনো দিন আব্বুকে ক্লাসে আসতে দেরি হতে দেখেনি। আজ কেন এমন হলো? কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না ও।

শিক্ষক লাউঞ্জে ঢোকার মুখেই প্রধান শিক্ষকের কক্ষ। আলম শিক্ষক লাউঞ্জে ঢোকার মুহূর্তে প্রধান শিক্ষক তাকে নিজের কক্ষে ডেকে নিলেন। আলম প্রধান শিক্ষকের সামনে কখনোই স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারে না। স্যারের কী এক প্রবল ব্যক্তিত্ব ওকে সংকোচে ফেলে দেয়। অন্যদের বেলায়ও কমবেশি এমনটি ঘটে।

'কি, ছুটি নেবে?' প্রধান শিক্ষকের জিজ্ঞাসা।

'না স্যার', আলমের জবাব। 'আব্বুর একটা ক্লাস ছিল আমাদের সাথে। কিন্তু উনি এখনও যাননি, তাই ডাকতে এসেছি।' মুখ নিচু করেই রেখেছে ও।

'ও, তুমি বুঝি জানো না তোমার আব্বু আজ ছুটিতে?' সহাস্যে জানতে চান প্রধান শিক্ষক।

অবাক হলো আলম। ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল—'আব্বু ছুটিতে? কিন্তু আমাকে তো কিছু বললেন না আসার সময়?' একবার মুখ তুলেই আবার নিচু করে নিয়েছে।

'হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন।' বললেন হেডস্যার। 'তা ছাড়া তার শরীরটাও ইদানীং খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। আমি নিজেই ভাবছিলাম তাকে কিছুদিন ছুটি দেবো। যাক, নিজেই ছুটি নিয়েছেন।' মনে হয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

'কিন্তু স্যার,' আলমের দ্বিধা তবু কাটে না। 'প্রয়োজন হলে আব্বু তো আমার মাধ্যমেই দরখাস্ত পাঠান।'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি।' বলে ড্রয়ার খুলে লম্বা ভাঁজ করা একটা কাগজ আলমের দিকে এগিয়ে দিলেন স্যার। বললেন—'এই যে দরখাস্ত। নিপুণ এনেছে।'

আলম হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল হেডস্যারের কাছ থেকে। পড়ল। বাড়ি থেকে বের হবার পরই মাথাটা ঘুরে ওঠে সাইদুল করিমের। বোঝাই যাচ্ছে কাঁপা কাঁপা হাতে সিগনেচার দেখে।

আলম বলল—'কিন্তু স্যার, নিপুণের বাড়ি তো ওদিকে না।'

স্যার বললেন—'নিপুণ আমাকে বলেছে, সে স্কুলে আসছিল। একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল আজ তার। কিন্তু নাদিরাকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে নিপুণকে দরখাস্তটা দিয়ে আমার কাছে পৌঁছে দিতে বলে। নিপুণ সে মতো দরখাস্তটা আমাকে দেয়।'

আলমের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী হলো হঠাৎ আব্বুর?

স্যার বললেন—'মন খারাপ কোরো না আলম। সামান্য মাথা ঘোরা তো, একটু রেস্ট নিলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।' তিনিও কিছু একটা ভাবলেন। তারপর বললেন—'যাও, ক্লাসে যাও। ছুটি দিতাম তোমাকে, কিন্তু সামনে ফাইনাল পরীক্ষা বলে দিচ্ছি না। তুমি যাও, আমি হারুন স্যারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আলমের মনটা মরে গেল। ও স্যারের শেষ কথাটা শুনতে পারেনি। তার আগেই প্রধান শিক্ষকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে। ধীর পদক্ষেপে ক্লাসের দিকে চলল। ভাবতে লাগল, আব্বুর হঠাৎ এমন কী হলো? সকালে তো ভালোই ছিলেন। একসাথে পুকুরে গোসল করলাম।

বাকি ক্লাসগুলোতে মন বসল না আলমের। বিজনের সাথে ভালোভাবে কথাও পর্যন্ত বলল না। একটা অশুভ লক্ষণ ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠতে চাইছে। ছুটি হলে দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরল।

বাড়িতে তখন কান্নার রোল উঠেছে। প্রতিবেশীরা বাড়ির উঠোনে ভিড় করে রেখেছে। এবার আলমের মাথার মধ্যে অশুভ সংকেতটা তীব্র শব্দ করে বেজে উঠল। বেড়ে দ্রুত হলো বুকের হার্টবিট। যেন বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য পাগল হয়ে গেছে।

‘কী হয়েছে?’ অস্ফুটেই ওর মুখ থেকে বাক্যটা বেরিয়ে এলো।

জবাবে এক প্রতিবেশী বলল—‘তোমার বাজানরে কারা জানি ছুরি মাইরা খুন করছে।’

হৃৎপিণ্ডটা দড়াম করে বুকের খাঁচায় আঘাত হানল এবার আলমের। যেন ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে যন্ত্রটা। কিন্তু বাধা পেয়ে আর বেরিয়ে আসা হলো না ওটার। তবে দড়াম দড়াম করে অবিরাম আঘাত হেনেই চলল খাঁচার জালে।

আলমের হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ল বই-খাতা। ‘কনে আব্বু?’ বলে ভিড় ঠেলে বারান্দায় উঠল ও। আরেকবার থমকে দাঁড়াল। বারান্দায় বিছানায় শোয়ানো ওর আব্বু। রক্তে ভেসে গেছে। বিছানা ও শরীরের পোশাক লালচে রং ধারণ করেছে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আলম। হাঁটু মুড়ে আব্বুর পাশে পড়ে গেল।

একটু তফাতে নাদিরার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা চলছে। রাহাতকে আশপাশ কোথাও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল আলম। ধীরে ধীরে মাথা তুলল তারপর। চোখের পানিতে ভেসে গেছে নাক-মুখ-বুক। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল টকটক করছে। ঠোঁটজোড়া কাঁপছে বেদনায়। চোখের ভেতরের ল্যাক্রিমাল গ্রন্থিতে থাকা অশ্রুরা কান্নারূপে বেরিয়ে আসতে একের পর এক ভিড় জমাচ্ছে যেন।

কিছুক্ষণ আব্বুর নিষ্পন্দ মুখপানে তাকিয়ে থাকল আলম একদৃষ্টিতে। আব্বুর মুখটা কেমন যেন বিমর্ষ দেখাল। তবে ঠোঁটের কোনে যেন সূক্ষ্ম এক চিলতে হাসি লুকিয়ে আছে। আলমের পুরো শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। বুঝতে পারল না কী এর রহস্য। এখন বোঝার উপায়ও নেই। ঠোঁটজোড়া বার কয়েক কেঁপে উঠল ওর। তারপর ‘আব্বু...!’ বলে ডুকরে কেঁদে উঠল এবং জ্ঞান হারাল।

এইমাত্র নাদিরার জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফিরতেই ফিরে এলো ভাইয়ের পাশে এবং চিৎকার করে উঠে আবার জ্ঞান হারাল।

***

তখন সন্ধ্যা। মায়াবী আঁধার নেমে এসেছে ধরণির পরে।

শামসুল আলমকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। গ্রামের লোকজনের সহায়তায় কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছে ও।

সাইদুল করিম সাহেবকে রাত ৯টা ১০ মিনিটে সরকারি গোরস্থানে দাফন করা হলো। জানাজায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল। আসলে এলাকায় সাইদুল স্যারের খুবই সুনাম ছিল। আশপাশের আরও কয়েকটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল তার গুণের

কথা। শিক্ষক হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন তিনি। মানুষ গড়ার সত্যিকার কারিগর ছিলেন তিনি। তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেকেই দেশের বিভিন্ন বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের মান উজ্জ্বল করছেন।

দাফন সেরে আলম বাড়ি ফিরে শুনল রাহাতের নিখোঁজ হওয়ার কথা। সাথে সাথে আশপাশ সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজল। রাত ১১টার দিকে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহে বাড়ি ফিরল।

নাদিরার অবস্থা খুব একটা ভালো না। একে তো পিতৃশোকে সারাদিন কেঁদেছে; তার ওপর এক্ষণে পুত্রশোকে ভেঙে পড়ল। কাঁদছে সে। কখনো ডুকরে, কখনো হাউমাউ করে অবিরাম কেঁদেই চলেছে।

সাইদুল করিম সাহেবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু কে বা কারা করেছে, তা জানা যায়নি। সকালে গ্রামের কিছু লোক ওই রাস্তা দিয়ে শহরে যাচ্ছিল কাজ করতে। ভেকুটিয়া বাজার ছাড়িয়ে বাঁশবাগানের কাছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় তারা। পথের মাঝে একটা লোক পড়ে আছে। রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

তাকে চিনতে পেরে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসে তারা। তখনও তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়নি। বারবার আলমের নাম করছিলেন তিনি। নাদিরা আব্বুকে দেখে ছুটে আসে। বারান্দায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লোক পাঠায় রিকশা ডাকার জন্য। উদ্দেশ্য বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। রিকশা আসে ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। এর আগে নাদিরা রাহাতকে একরকম জোর করেই স্কুলে পাঠায়, আলমকে খবর দিয়ে ডেকে আনার জন্য।

রাত সাড়ে ১১টা। নিকষকালো আঁধার চতুর্দিকে। এক হাত সামনের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। সকালের ঝকঝকে আকাশটা এখন ততটাই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। যেন বেদনার নীল মেখে ক্রমে কালো বর্ণ গ্রহণ করেছে।

উঠানে পেয়ারা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে আলম। পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি। পাশের বাড়ির ফাতেমা চাচি ওকে খাওয়ানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও খায়নি। খেতে ইচ্ছে করছে না প্রচণ্ড রাক্ষুসে ক্ষিধে পেটে থাকা সত্ত্বেও।

অন্য দিন সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে আসতে প্রচণ্ড ভয় পায় আলম। মনে হয় পেছন থেকে কেউ ওর চোখ মুখ চেপে ধরে ওকে মেরে ফেলবে। আজ সেটা মনে হচ্ছে না। আব্বুকে সে ওই অন্ধকার কবরে রেখে এসেছে। আব্বু কি ওখানে খুব ভয় পাচ্ছে? ও জানে, মৃত্যুর পর মানুষের ভয় পাওয়ার আর কিছুই থাকে না। কারণ, তখন থেকেই শুরু হয় হিসাবনিকাশ। কবর থেকেই তার শুরু। কবরের তিনটি প্রশ্নের জবাব যে

দিতে পারবে, পরবর্তী হিসাব তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং জান্নাতের সাথে তার কবরের একটি সংযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। কিয়ামত পর্যন্ত কবরে থেকেই জান্নাতের নিয়ামত উপভোগ করতে পারবে। 'হে আল্লাহ!' মনে মনে বলে উঠল ও, 'আব্বুর কবরটাকে তুমি জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করে দাও মাবুদ!'

নাদিরা এক্ষণে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

আলম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একবার এলোমেলো ভাবল। তারপর নিজের অবস্থাটা চিন্তা করল। নিজেকে বড়ো একা ও অসহায় মনে হলো ওর। মাথার ওপরের বিশাল বটবৃক্ষের ছায়াটা সরে গেছে একনিমিষেই। তদস্থলে স্থান করে নিয়েছে গভীর কালো একটা পর্দা। ধীরে ধীরে সেটা প্রশস্ত ও গভীর হচ্ছে। ও বুঝতে পারছে, ভয়াল একটা রাত ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সে রাতের বিস্তার কতটা গভীর, ও তা বুঝতে পারছে না।

একটা ঝিঁঝি পোকা একটানা ডেকে চলেছে তার বিরক্তিকর সুরে। রাতটাকে আরও ভয়ংকর করে তুলল রাতজাগা একটা প্যাঁচার কর্কশ ডাক। গাছের পাতা নড়ছে না একবিন্দু। গুমোট বাঁধা একটা থমথমে পরিবেশ। কোনো কিছুর জন্য বুঝি প্রস্তুতি চলছে।

চমকে উঠল আলম। কে ডাকে অমন করে? নাকি মনের ভুল?

কান পেতে রইল আবার শোনার জন্য।

'আ...য়...! আ...য়...!' আবার শোনা গেল গম্ভীর সেই আহ্বান।

উঠে দাঁড়াল আলম। কী এক আকর্ষণ যেন আছে ওই আহ্বানে।

ভয়াল রাত যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সব ভুলে এগিয়ে চলল আলম মন্ত্রমুগ্ধের মতো শব্দের উৎস লক্ষ করে।

দুই

'তারপর কী হলো?' জিজ্ঞেস করল বিপ্লব।

একটানা কথা বলে দম নেওয়ার জন্য একটু থেমেছিল আলম। তখন জিজ্ঞেস করল বিপ্লব।

বিপ্লব বিজনের খালাতো ভাই। বেড়াতে এসেছে বিজনদের বাড়ি। এসেই শুনেছে আলমের আব্বার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর। আর শুনেই চলে এসেছে আলমের সাথে কথা বলতে। রহস্যের গন্ধ পেয়েছে ও। তাই জেনে নিচ্ছে পুরো ঘটনাটা।

একটা পুকুরপারে শিমুল গাছের নিচে দুর্বা ঘাসের ওপর বসেছে তিনজন।

আজকের আকাশটাও ঝকঝকে। ফুরফুর করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। আবেশে প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু এই পরিবেশটা উপভোগ করতে পারছে না ছেলেরা। আলমের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নিয়ে এতটাই মজে গেছে যে, বাস্তব পরিবেশটা নিয়ে ভাবতে পারছে না; বরং ঘটে যাওয়া ব্যাপারটাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি।

'নিঝুম রাত,' আবার বলতে শুরু করেছে আলম। 'ঝিঁঝির ডাকও থেমে গেছে। পুরো ভেকুটিয়া গ্রামটা যেন নিঝুমপুরীতে পরিণত হয়েছে। কোনো এক অদৃশ্য আকর্ষণে এগিয়ে চলেছি আমি। পশ্চিম দিক থেকে এসেছে শব্দটা, মানে ওই ডাকটা। আর অল্প একটু সামনেই মুক্তেশ্বরী নদী। ঠান্ডা ঠান্ডা একটা আভাস এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।'

একটু দম নিল আবার আলম। তারপর আবার শুরু করল—'এগিয়ে চলেছি আমি। সামনে একটা বাঁশঝাড়। অন্ধকারে কেমন যেন দেখাচ্ছে বাঁশ গাছগুলোকে। যেন কোনো রক্তপিপাসু প্রেতাত্মা তার অসংখ্য হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে শিকার ধরার উদ্দেশ্যে। গায়ের মধ্যে গুলিয়ে উঠল আমার। কিন্তু তবুও একই গতিতে পা দুটো এগিয়ে চলল; বরং চলার গতি যেন ক্রমশ দ্রুততর হতে লাগল। হঠাৎ কীসে হোঁচট খেলাম। মুখ থুবড়ে পড়ার মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠের একটা প্যাঁচার ডাক কানে গেল। এতক্ষণে ভয় লাগতে শুরু করেছে। প্যাঁচার ডাক শুনে কলিজা শুকিয়ে গেল। বুকটা ধুকপুক করা শুরু করে দিয়েছে। "ইয়া আল্লাহ! মরে গেছি আমি!" বিড়বিড় করে বললাম। কিছুক্ষণ ওভাবেই পড়ে রইলাম। তারপর যখন শিওর হলাম আমি ঠিকই আছি, তখনই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। হাত দিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়লাম। আমি যখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি এবং সামনে তাকিয়েছি, ঠিক তখনই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোর বন্যায়—যেন কোনো সার্চলাইট তাক করা হয়েছে আমার দিকে। ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলাম আমি, কী করব বুঝতে পারলাম না।

"আ...য়...! আ...য়...!" আবার শোনা গেল সেই ডাক। তবে আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট, ভরাট ও পুরুকণ্ঠ। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার। চোখে শুরু হয়েছে তীব্র জ্বালা। এমনিতেই বুজে গেল ও দুটো। কানে আসছে হাসির শব্দ। বিশ্রী ও ভয়ংকর সে হাসি। যেন কাঠফাটা রোদের মধ্যে ঠা ঠা করে কাঠ ফাড়ছে কেউ। মনে হলো দেহের

সব রক্তকণিকাগুলো অসাড় হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ! হঠাৎ তুমুল বর্ষা শুরু হলো। ভিজছি আমি, কিন্তু কোনো হুঁশই যেন নেই আমার। শীত শীত লাগতেই চোখ মেললাম। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম যেন। চারদিকে অন্ধকার। সেইসাথে মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের ছুটে চলা।

কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, "পালাও!" মনে হলো নদীর দিক থেকে গাছপালা ভেঙে কিছু একটা ছুটে আসছে। কিছুদিন আগে বয়ে যাওয়া আমফানের কথা মনে পড়ল। একটানা ঘণ্টাব্যাপী বয়ে যাওয়া সে ঝড় অনেক অঞ্চলের বাড়িঘর তছনছ করে দিয়ে গেছে। একটানা এত দীর্ঘক্ষণ বয়ে যাওয়া ঝড় ইতিহাসে বোধ হয় এটাই প্রথম। দৌড়াতে শুরু করলাম আমি পেছন দিকে। হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলাম কয়েকবার। কিন্তু হাচড়ে-পাচড়ে উঠে আবারও দৌড়। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে কীসের সাথে যেন ধাক্কা খেলাম। জ্ঞান হারাতে গিয়েও প্রবল ঝাকুনিতে পুরো সজাগ হয়ে গেলাম। গলা চিরে বেরিয়ে এলো—কে, কে? জবাব এলো, আমি নিপুণ। তুমি কনে গিইলে? এভাবে দৌড়াচ্ছিলে ক্যান? কিন্তু প্রবল মানসিক চাপ আর ক্ষুধার্ত নার্ভগুলো আর কাজ করল না। আমি জ্ঞান হারিয়ে তার গায়ের ওপর পড়ে গেলাম।'

থামল আলম। এখনও যেন হাঁপাচ্ছে।

ও থামলেও বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। একটা পিন পড়লেও যেন তার শব্দ শোনা যাবে।

শেষে নীরবতা ভাঙল বিপ্লব। বলল—'হু! ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অলসো এক্সাইটিং।'

আলম দুই হাতে মাথা চেপে ধরে কী যেন ভাবছিল। তারপর হঠাৎ বিপ্লবের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল—'আমাদের তুমি বাঁচাও বিপু ভাইয়া। ভয়াল রাতের ওই হাতছানি আমি আর শুনতে চাই না!'

ঝট করে ওর দিকে তাকাল বিপ্লব। বলল—'কী বললে? ভয়াল রাতের হাতছানি?'

বিজন বলল—'হ্যাঁ, আলম ওই ডাকের নাম দিয়েছে ভয়াল রাতের হাতছানি।'

'ও আচ্ছা।' বলল বিপ্লব। একটু ভাবল। তারপর আবার বলল—'আচ্ছা আলম, এ পর্যন্ত কতবার তুমি ওই ডাক শুনতে পেয়েছ? সব সময় কি গভীর রাতেই শুনতে পাও? তুমি একা শোনো না আরও কেউ শুনতে পায়?'

আলম ধীরে ধীরে মাথা তুলল। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ও এখন। বলল—'সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। দুই-তিন রাত বোধ হয় বাদ গেছে।' একটু ভাবল। 'মানে ছয়-সাতবার হবে।'

'প্রতিবারই কি ছুটে গেছ?'

‘হ্যাঁ, প্রতিবারই ছুটে গেছি।’ মাথা নেড়ে বলল আলম।

‘কেন ছুটে গেছ?’

‘তা তো জানি না। ওই ডাক শুনলেই আমার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।’ যেন এক্ষুনি আবার ছুট দেবে আলম। বিজন ওকে থামাল।

‘আচ্ছা, এমন কি কখনো হয়েছে যে, তোমার সাথে সাথে অন্য কেউ ছুটে গেছে কিংবা কেউ তোমার আগেই চলে গেছে?’ বিপ্লবের জিজ্ঞাসা।

আলম এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, না।

বিপ্লব বলল—‘প্রতিবারই কি ওই বাঁশঝাড়ের ওখানে থেমে যাও?’ মনে হয় রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে বিপ্লব খান।

‘হ্যাঁ। ওখানে পৌঁছলেই চোখে তীব্র আলো এসে পড়ে। তারপর তীক্ষ্ণ হাসি। আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসি আবার বাড়িতেই।’ আলমের জবাব।

নিচের ঠোঁটে বার দুয়েক চিমটি কাটল দাঁত দিয়ে বিপ্লব। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল—‘কখনো দিনের বেলা ওদিকে গিয়েছ?’

‘না, আমার ভয় করে।’ গা ছমছম করে উঠল যেন আলমের। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে।

বিজন বলল—‘আমি গিয়েছি।’

বিপ্লব এবার সরাসরি বিজনের দিকে তাকাল। বলল—‘কী দেখেছ?’

‘কী দেখেছি মানে?’ বলল বিজন। ‘এই শোনো, বাঁশঝাড়ের ওপাশে একটা রাস্তা। রাস্তার ওপাশে কিছু ঢালু জমি, তারপর নদী।’

‘ও।’ থেমে গেল বিপ্লব। আশা করেছিল বোধ হয় অন্য কিছু শোনার। কিন্তু বিজনের ওই জবাবে যেন আর কিছু বলার বা জানার নেই।

আলম হঠাৎ বিপ্লবের দুই হাত জড়িয়ে ধরল। অনুরোধের সুরে বলল—‘তুমি চলে যাও বিপু ভাইয়া। আজই তুমি বাড়ি চলে যাও!’

বিপ্লব অবাক হলো। এই একটু আগেই ও বিপ্লবকে অনুরোধ করেছিল এই বিপদ থেকে ওদের উদ্ধার করতে। এখন এ কথা বলছে কেন? জিজ্ঞেস করল—‘কিন্তু কেন আমি চলে যাব? এই তো একটু আগেই তুমি আমাকে বললে, ‘ভয়াল রাতের হাতছানি থেকে তোমাকে বাঁচাতে।’

‘আমার খুবই ভয় করছে।’ বলল আলম। ‘আমার মন বলছে, এই গ্রামে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।’

‘যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। তোমার আব্বু খুন হয়েছেন।’ বলল বিপ্লব।

‘না বিপু ভাইয়া। আমি বুঝতে পারছি, ভয়ংকর কিছু একটা এখনও ঘটার বাকি আছে।’ বিপ্লব খানকে আর সবার মতো বিপু ভাইয়া বলতে শুরু করেছে আলম।

একটু মুচকি হাসল বিপু ভাইয়া। বলল—‘ওটা তোমার দুর্বল মনের জল্পনা।’

‘হতে পারে, কিন্তু তোমার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। আর আমার আব্বু তো সামান্য একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন।’ আলম তার কথায় অনড়।

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ওই ভয়ংকর ডাকের সাথে তোমার আব্বুর খুনের সম্পর্ক আছে?’ কোনো সূত্রই হাতছাড়া করতে চায় না কিশোর গোয়েন্দা বিপ্লব খান ওরফে বিপু ভাইয়া।

‘জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না’ বলে দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আলম।

‘কিন্তু আমি শুনেছি তোমার আব্বুর নামডাক আশপাশের আরও চার-পাঁচটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।’ আলমের অজুহাত মানতে নারাজ বিপ্লব। ‘তোমার আব্বুর এভাবে খুন হওয়াটা সত্যিই অস্বাভাবিক।’

বিপ্লব দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। আনমনে ঘাসের একটা ডগা নখ দিয়ে কাটতে লাগল।

বিজন পুকুরের পানিতে একটা ঢিল ছুড়ে দিয়ে তৈরি হওয়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিপ্লব উঠে একটু পায়চারি করল। তারপর আলমকে ধরে ওঠাল। আলম ততক্ষণে কিছুটা শান্ত হয়েছে। ওকে মোটামুটি সতেজ লাগছে। আব্বা মারা যাওয়ার পর বোধ হয় এই প্রথম কাঁদল। ভাবল বিপ্লব। যাক, ভালোই হয়েছে। মনের ভাব কিছুটা কমছে এতে।

আলম বলল—‘আমাকে ক্ষমা করো বিপু ভাইয়া। আসলে আমি খুবই ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম।’

বিপ্লব বলল—‘আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি আলম। তুমি কিছু চিন্তা কারো না। এর মধ্যে যদি কোনো রহস্য থেকেই থাকে, তবে সে রহস্যের জাল আমি

ছিঁড়বই। মনে রেখো, বিপু যখন কোনো ব্যাপারে একবার নাক গলায়, তখন এর শেষ না দেখে থামে না।'

'আমি বিজনের কাছে তোমার ব্যাপারে অনেক শুনেছি।' বলল আলম। 'তুমি যে বেশ বড়ো মাপের একজন ডিটেকটিভ, তা আমি জানি।'

'ও বোধ হয় একটু বাড়িয়েই বলেছে তোমাকে।' অন্যের মুখে নিজেই প্রশংসা শুনলে এভাবেই মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় বিপ্লবের। 'আমি আসলে কোনো গোয়েন্দা না, চেষ্টা করি ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সত্যটা বরে করার।' একটু থামল। তারপর আবার বলল—'যাকগে, এখন আবার একটু পেছনে ফিরতে চাচ্ছি আমি। সেদিন জ্ঞান হারানোর পর কী ঘটল?'

'আর কী ঘটবে? নিপুণ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলো। সেই রাতেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। স্বপ্ন দেখলাম কয়েকবার। জ্বরের কারণেই দুই-তিন দিন কোনো ডাক শোনা গেছে কি না বলতে পারব না। আর স্বপ্নে কী দেখতাম শুনবে?' বলে জিজ্ঞাসুনেত্রে বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে রইল। তবে বিপ্লবের জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল—'দেখতাম, আব্বু এসে আমাকে বলছে—"খোকা, তুই আমার খুনের বদলা নিবি না? তুই ওদের ছেড়ে দিবি?" হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদত। বলল—"আমাকে তুই মাফ করে দে খোকা। আমি তোর জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শয়তানরা আমাকে সে সুযোগ দিলো না।" আরও দেখতাম, রাহাতকে কারা যেন আটকে রেখেছে। ও খুবই কাঁদছে ওর আম্মুর কাছে আসার জন্য, কিন্তু কিছুতেই আসতে পারছে না।' আলমের চোখ দুটো আবারও টলমল করে উঠল।

বিপ্লব ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'তোমাকে শক্ত হতে হবে আলম। তুমি যদি ভেঙে পড়ো, তাহলে চিন্তা করো, তোমার বোনের অবস্থাটা কী হবে? তা ছাড়া রাহাত এখনও নিখোঁজ রয়েছে। আমরা এখনও জানি না তার কী হয়েছে। আমি বিজনের মুখে তোমার সম্বন্ধে সবই জেনেছি। তোমাদের মতো ছেলেরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ। মনে করো এটা তোমার একটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তোমাকে পাস করতেই হবে। কেবল পাস মার্ক নিয়ে পাস করলে হবে না, A+ পেতে হবে তোমাকে। মনে রাখবে, সাহসী মানুষেরা কোনো দিন ভেঙে পড়ে না। কোনো পরাজয়কেই তারা পরাজয় বলে মনে করে না; বরং সেখান থেকেই শুরু হয় তাদের বিজয়।'

আলমের চোখের কোনে অশ্রু শুকিয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে গেছে ও বিপ্লবের কথায়। তাই তো, এমন কথা তো আগে কেউ ওকে শোনায়নি! কী চমৎকার করে কথা বলল বিপু ভাইয়া! পরিস্থিতিটাকে কত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করল। বিপ্লবের ভক্ত হয়ে গেল ও।

বিজনও মুগ্ধ, বরং চমৎকৃত বিপ্লবের কথায়। বিপ্লবের অনেক গুণের কথা জানে বিজন; কিন্তু ও যে একজন ভালো বক্তাও, তা জানা ছিল না।

সন্ধ্যার আভা তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে কিচিরমিচির রব তুলে। ভেসে এলো মাগরিবের আজান।

বিপ্লব বলল—'চলো যাওয়া যাক। কাল সকাল থেকেই আমাদের অভিযান শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ।'

চলতে শুরু করল ওরা। এদিকে পৃথিবী ডুবে গেল আরেকটি প্রভাতের আশায়।

তিন

পরের দিনটি ঘুরেফিরেই কাটাল বিপ্লবরা।

গ্রামের মোটামুটি দর্শনীয় স্থানগুলো বিপ্লবের দেখা হয়ে গেল।

মাঠভরা সবুজ কচি ধান। ধানের আইল দিয়ে হাঁটল। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে মাছরাঙা, বক আর চ্যাগা পাখি উড়ে পালাল। একটা গুইসাপ দেখে আরেকটু হলে বিপ্লব তো পড়েই যাচ্ছিল খেতের মধ্যে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে একটা খরগোশ। ধান ভুঁই থেকে উঠে কেবল একটা কাশের ভুঁই-এর মধ্য দিয়ে পায়ে চলা একটা পথ দিয়ে হাঁটছিল ওরা। এই সময় দেখা দিলো খরগোশটা। সবাই মিলে তাড়া করল। ধরা অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কোথায় যে লুকাল ওটা, ওরা বুঝতে পারল না।

ভাট আর আশশটি ফুল দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল ওদের। বিশেষ করে বিপ্লবের। সেইসঙ্গে ওদের মাতাল করা গন্ধ ওকে আরও পাগল করে তুলল।

এসব দেখতে দেখতে ওরা যখন চলছিল, হঠাৎ কীসের সাথে যেন হোঁচট খেতে খেতেও নিজেকে সামলে নিল বিপ্লব। মাঠের মধ্যে পাটগাছের একটা গোড়া—যেটা এখনও খেতে রয়ে গেছে পাট কেটে নিয়ে যাওয়ার পরও। সেটাতেই বিপ্লবের ডান পায়ের বুড়ো আঙুল বেঁধে গেল। হায়! হায়! করে এগিয়ে এলো বিজন ও আলম।

ওকে নিয়ে একটা অলিতে বাসাল ওরা। পায়ের আঙুলটা একটু ছড়েও গেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বিপ্লবের জানা আছে যে, এ রকম পরিস্থিতিতে দূর্বা ঘাস চিবিয়ে বা দুই হাতের তালুতে ডলে তার রস লাগালে ক্ষতস্থানের রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং ক্ষত দ্রুত শুকিয়েও যায়। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই আলম দূর্বা ঘাসের কয়েকটা কচি পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবাতে লাগল। তারপর মুখ থেকে রসসহ চিবানো পাতা বের করে বিপ্লবের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলো।

বিপ্লব তখনও বসে আছে। হঠাৎ সামনে দেখল গোলাকৃতির দুটো সবুজাভ ফুল পড়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়েই ফুল দুটো হাতে উঠিয়ে নিল ও।

'ওগুলো দূর্বা ফুল।' বলল বিজন।

বিজনের এই কথার পর ফুল দুটো আরও ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখল বিপ্লব। দূর্বা ঘাসেরও যে ফুল হয়, এটা ওর আগে জানা ছিল না। যাহোক, পরে ও গুগলে সার্চ দিয়ে দূর্বা ঘাস সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জেনে নিয়েছে। এই যেমন : দূর্বা ঘাসের ইংরেজি নাম বার্মুডা গ্রাস। বৈজ্ঞানিক নাম সাইনোডন ডেকটাইলন পার্স। এটা বহু বর্ষজীবী বিরুৎ, যেটা আগাছা হিসেবেই বেশি পরিচিত। গাছের রং হালকা সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ। দূর্বা ঘাস বেশ উপকারী। ওষুধ হিসেবে এটা গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার হয়ে থাকে। কাটা স্থানের রক্ত পড়া বন্ধ করতে, অশ্বরোগে, পায়ের একজিমায়, অরুচি ও শ্রান্তিতে, মুখের ব্রণ সারাতে, চুলপড়া বন্ধ করতে, বাত ব্যথায়, দাঁতের অসুখ পায়োরিয়া সারাতে এই উদ্ভিদ ব্যবহার করা যায়।

আবার হাঁটতে শুরু করল ছেলেরা। বিপ্লবের পায়ের আঙুল থেকে রক্ত পড়া আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন হাঁটতে আর ততটা কষ্টও হচ্ছে না।

রং-বেরঙের পাখি, ফুল আর মনকাড়া সব দৃশ্য দেখে বিপ্লবের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ইচ্ছে হলো প্রজাপতির মতো দুটি ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে। ফুলে ফুলে গিয়ে ওদের ঘুম ভাঙাতে আর মধু সংগ্রহ করতে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর সবকিছু পূরণ করা যায় না। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। এ সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষেরই জন্য।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন দুপুর হয়ে গেল। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে সবারই! পেটের মধ্যে যেন কয়েকটা করে ছুঁচো নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।

আলমের আজ বিজনদের বাড়ি খাওয়ার কথা দুপুরে। কাজেই ওরা সোজা বিজনদের বাড়িতেই চলল।

সবার আগে দুপুরের নামাজ সেরে নিল ওরা। বাড়িতেই নামাজ পড়ল। ইমামতি করল বিপ্লব। যদিও ও এখানে মুসাফির, চার রাকাত ফরজ নামাজের দুই রাকাত পড়লেই ওর হয়ে যায়, কিন্তু বিজন ও আলমের পীড়াপীড়িতে ওকেই নামাজ পড়াতে হলো। কাজেই ও দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরানোর পর অন্য দুজন নিজেরা অবশিষ্ট দুই রাকাত নামাজ আদায় করে নিল।

এরপর বিপ্লব পেছনে সরে এলো এবং অন্যরা সুন্নত নামাজ পড়ল। বিপ্লব একটা চেয়ারে বসে ওদের নামাজ পড়া দেখছিল। এতে ওর কপাল কয়েকবার কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ওদের নামাজ শেষ হলে পুরুষদের জন্য সিজদার একটা নিয়ম জানাল, যেটা

বুখারি শরিফের ৮২২ নম্বর ও মুসলিম শরিফের ৪৯৩ নম্বর হাদিস। আসলে বিজন সিজদায় যাওয়ার সময় ওর হাত দুটো মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিল—এটা দেখেই বিপ্লব হাদিসটা বলল।

বিপ্লব বলল—'শোনো বিজন ও আলম, তোমাদের আমি একটি হাদিস শোনাই। হাদিসটি ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিমসহ অনেক ইমাম তাঁদের হাদিসের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত সাহাবি আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের অন্যতম রোকন সিজদার একটি নিয়ম এই হাদিসে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—"তোমরা ঠিকভাবে সিজদা করো। তোমাদের কেউ যেন সিজদায় তার হাতকে বিছিয়ে না দেয়, যেভাবে কুকুর বিছিয়ে দেয়।" সহিহ মুসলিমের পরবর্তী হাদিসে বলা হয়েছে—"যখন তুমি সিজদা করবে, তখন দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখবে। আর দুই কনুই উঁচু রাখবে।" একটু লক্ষ করো তোমরা—প্রথম হাদিস অনুসারে কুকুর যখন অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকে, তখন যেভাবে তার সামনের দুই হাত জমিনে বিছানো থাকে, সিজদায় ওইভাবে হাত বিছিয়ে দেওয়া নিষেধ। আর দ্বিতীয় হাদিসের ব্যাপারে বলা যায়—সিজদায় দুই হাতের বাহু পাঁজর থেকে আলাদা থাকবে এবং পেট ঊরু থেকে আলাদা থাকবে আর দুই হাত অর্থাৎ কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত অংশ মাটি থেকে ওপরে থাকবে।' কথাগুলো বলে থামল বিপ্লব।

বিপ্লবের কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বিজন ও আলম। মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল ওর সুন্দর উপস্থাপনায়। তাই বিপ্লব থামতেই বিজন বলে উঠল—'তুমি আমাকে একটা ভালো বিষয়ে জানালে বিপু। আসলে এই হাদিসগুলো আমার পড়া হয়নি। এখন থেকে আমি এগুলো অবশ্যই পরিপূর্ণ আমল করব।'

আলম বলল—'তুমি এত জ্ঞান রাখো বিপু ভাইয়া? আমার তো খুব হিংসে হচ্ছে তোমার প্রতি।'

বিপ্লব মুচকি হাসল। বলল—'এ ব্যাপারে তুমি হিংসে করতেই পারো। কারণ, বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসে আমাদের প্রিয়নবি যে দুটি বিষয়ে হিংসার অনুমতি দিয়েছেন, তার মধ্যে এটাও পড়ে।'

আলম বলল—'হাদিসটা শোনাও না বিপু ভাইয়া!'

'তুমি বলতে না বললেও আমি বলতাম। জ্ঞান জাহির করার এ সুযোগটা ও হাতছাড়া করতে চাই না। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"কেবল দুটি বিষয়ে ঈর্ষা বা হিংসা করা যায়। **এক.** ওই ব্যক্তির প্রতি;

যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন।

দুই. ওই ব্যক্তির প্রতি; যাকে মহান আল্লাহ হিকমত অর্থাৎ জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।" কাজেই আমি যে একটি বিষয়ে জেনে তোমাদের সে ব্যাপারে জানাচ্ছি, এজন্য তোমরা আমার চেয়েও আরও বেশি জানার জন্য আমার প্রতি হিংসা করতেই পারো।'

'না বিপু ভাইয়া।' বলল বিজন। 'তোমার সাথে কথায় পারা যাবে না। তুমি আসলে সব দিক থেকেই গ্রেট।'

আলম বলল—'আমি বিজনের মুখে তোমার নাম শুনেছি। ও তোমার অনেক প্রশংসা করেছে, অনেক গুণের কথা বলেছে। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, ও কিছুই বাড়িয়ে বলেনি; বরং একটু কমই বলেছে। আমি তোমাকে যত দেখছি, তোমার সাথে যত মিশছি এবং তোমার কাছ থেকে যত কিছু জানছি , আমি আসলেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছ।'

বিপ্লব বলল—'তোমরা আসলে একটু বাড়িয়েই বলছ। তোমরাও ইচ্ছে করলে আমার মতো কেন, আমার চেয়ে আরও বেশি জানতে পারো। আর সেজন্য মহান রবের কাছে চাইতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সর্বদা সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। সময়ের অপচয় কোনোভাবেই করা যাবে না। আমার আব্বু বলেন—"এখন তোমাদের শেখার ও জানার সময়। কারণ, এখন তোমাদের হাতে প্রচুর সময়। এই কিশোর বয়সে তোমরা যত জানবে ও শিখবে, পরবর্তী সময়ে সেটাই তোমাদের জীবনে কাজে লাগবে। কেননা, এই কৈশোরের মতো ফ্রি সময় জীবনে আর আসবে না। কৈশোর ছাড়িয়ে যখন তোমরা যৌবনে বা বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখন ইচ্ছে করলেও এখনকার মতো জানতে ও শিখতে পারবে না। কারণ, তখন সময়ই পাবে না। দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় তখন তোমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখবে। কাজেই সময় থাকতে সময়ের মর্যাদা দিতে হবে। আর এই সময়কে কাজে লাগিয়ে তুমি কিশোর বয়সে যত বেশি জানতে ও শিখতে পারবে, পরবর্তী জীবনে সেটা কাজে লাগিয়ে তুমি অনেক বড়ো হতে পারবে। হতে পারবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা।" তাই আমার আব্বুর কথামতো আমি চেষ্টা করি। জানি এর থেকেও বেশি জানার ও শেখার আমার সুযোগ আছে, কিন্তু আমি আসলে এর চেয়ে বেশি পারিনে।' এতগুলো কথা একসাথে বলে এবার থামল বিপ্লব। লম্বা করে পরপর দুটো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও।

আলমের বিস্ময়ের তখন অন্ত নেই। তাই বিপ্লব থামলেও কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না।

বিজনের অবস্থাও একই রকম। এতক্ষণ যেন হ্যাঁ করে গোগ্রাসে গিলছিল বিপ্লবের বলা কথাগুলো।

আলমই প্রথম মুখ খুলল। বলল—'আমার খুবই লোভ হচ্ছে বিপু ভাইয়া, তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট হওয়ার। জানি অতটা ভালো ছাত্র আমি না, তবে আমি আজ থেকেই চেষ্টা করব প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানোর।'

'তুমি অবশ্যই সফল হবে।' বলল বিপ্লব। 'আসলে ইচ্ছাশক্তিটাই আসল। মানুষ কোনো ভালো কাজের নিয়ত করলে তার অর্ধেকটা তখনই পূর্ণ হয়ে যায়।'

কথা আরও এগোত, কিন্তু ওদের সামনে অনেক কাজ। তাই নামাজ-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বিকেলের আগে আগে আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। তদন্তে নামার আগে গ্রামটা সম্বন্ধে যতটুকু পারা যায়, জেনে ও বুঝে নিতে চায় বিপ্লব।

গ্রামের লোকেরা সত্যিই খুব অতিথিপরায়ণ—বিপ্লব তা নিজেই বুঝতে পারল। সবাই হাসিমুখে আলাপ করল ওর সাথে। অনেকে কিছু খেতেও দিলো—যার অধিকাংশই নিজেদের গাছের বা ঘরে বানানো।

আলমের আব্বার জন্য অনেকে সমবেদনাও জানাল। পাশাপাশি রাহাতের নিখোঁজ হওয়া নিয়েও অনেকে অনেক রকম কথা বলল। তবে প্রায় সবাই কামনা করল, ছেলেটার যেন কোনো বিপদ না হয় এবং দ্রুত ফিরে আসুক।

গ্রামটা মুহূর্তে ভালো লেগে গেল বিপ্লবের।

মুক্তেশ্বরী নদীটা ভেকুটিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশঘেঁষে বয়ে গেছে। এখন প্রায় শুকনো। দুই পাশের ঢালু কিনারা দেখে বোঝা যায়, একসময় বেশ খরস্রোতা ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর মতো এটাও এখন একটু সরু খালের মতো রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে যেটুকু এখনও পানি আছে, তাতে দু-একটা জেলে নৌকা ও ডিঙি নিয়ে চলাচল করে। এমনই একটা ডিঙিতে চড়ে বসল ওরা। বিপ্লবের অনেক দিনের শখ নদীতে নৌকা বাইবে আর ভাটিয়ালি গান গাইবে; যদিও গলা তত ভালো না। আজ সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করল। গান অবশ্য বিজনই গাইল।

বিজন ও আলম বিপ্লবকে দেখিয়ে দিলো কীভাবে বৈঠা চালাতে হয়। নৌকার গতি চেঞ্জ করতে হলে কোন দিকে বৈঠা দিয়ে জোরে পানিতে আঘাত করতে হয়, তা অল্প সময়েই ও রপ্ত করে নিল।

পুরোপুরি বিকাল না হলেও বাতাস বেশ কোমল। রোদের ঝাঁঝ একেবারে নেই বললেই চলে। নদীর উভয় তীরে এই সময়ও অনেকে গোসলসহ অন্যান্য কাজ করছে। একপাশে একটু জংলার মতো দেখা গেল। সেখানে হাঁসদের অবাধ বিচরণ।

বিজন তার দরাজ কণ্ঠে গান ধরেছে—

'নোঙর ছাড়িয়া নায়ের দেরে দে মাঝি ভাই

বাদাম উড়াইয়া নায়ের দেরে দে মাঝি ভাই...'

এভাবে কত সময় কাটল, তা কেউ জানে না। শরীরগুলোও ক্রমে ক্লান্তিতে নুয়ে পড়তে লাগল।

বিপ্লবের মনে হচ্ছিল—আরও কিছুক্ষণ এভাবেই কেটে যাক; কিন্তু একসময় আলম বলল—'চলো এবার ফেরা যাক।'

'এখনই ফিরব?' বিপ্লব অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

'সন্ধ্যা তো হয়ে এলো।' বিজন বলল। 'দেরি করলে আম্মু বকা দেবে।'

'ঠিক আছে চলো।' অগত্যা রাজি হতেই হলো বিপ্লবকে।

ডিঙি তীরে ভিড়ল। নেমে পড়ল ওরা নোঙর করে।

নদীর ঢালু অংশ যেখান থেকে শুরু হয়েছে, এদিকে সেখানে একটা ডুমুর গাছ ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে সগৌরবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। সেদিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল বিজন। তা দৃষ্টি এড়ালো না বিপ্লবের। জিজ্ঞেস করল—'কী হলো? অমন চমকে উঠলে যে?'

'নিপুণ!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল বিজন।

'নিপুণ?' যেন প্রতিধ্বনি করল আলম।

'হ্যাঁ, ওই ডুমুর গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে নজর রাখছিল।' গাছটা দেখিয়ে বলল বিজন।

'কুইক! ওকে ধরতে হবে' বলেই ছুটতে শুরু করল বিপ্লব। ছুটল বিজন ও আলমও।